অভী চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের গান:
গানের তথ্য গানের সত্য

boobook

boobook

সূচি

প্রাক্‌কথন ৯

ভূমিকা ১১

প্রথম অধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের গান: তথ্য ও সত্য প্রসঙ্গ ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়
তথ্য-সহায়ক গান ২৩

তৃতীয় অধ্যায়
তথ্য-বিম্নিত গান ৯০

চতুর্থ অধ্যায়
রচনা-পরবর্তী তথ্য ও সত্য ১২৪

পঞ্চম অধ্যায়
বদলে যাওয়া গান ১৮৪

উপসংহার ১৯৫

গ্রন্থপঞ্জি ১৯৮

boobook boobook

প্রাক্‌কথন

২০০০ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে স্নাতকোত্তর গবেষণা করবার একটি দুর্লভ সুযোগ করে দিয়েছিল। রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে বর্তমান এম.ফিল গবেষণা সেই সুযোগের পরবর্তী ফসল।

রবীন্দ্রসংগীত-শিক্ষা গ্রহণের ফলে রবীন্দ্রনাথের গানের কিছু প্রায়োগিক দিক আমি জানতে পেরেছি, যা কোনো-না-কোনোভাবে এই গবেষণার অনুকূল হয়েছে। ছায়ানট সংগীত বিদ্যায়তনে যাঁরা আমার সংগীত-শিক্ষক ছিলেন, তাঁদেরকে আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি।

এই গবেষণার শিরোনামটি ২০০২-এ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক চিত্তপ্রিয় ঘোষ আমাকে দিয়েছিলেন। সেই সময়ে উচ্চশিক্ষার্থে, এমনকি বিনা-বেতনে ছুটি না পাওয়ায়, কলকাতায় গিয়ে গবেষণাটি করতে পারিনি। কেবল শিরোনামটিকে ভালোবেসে আগলে রেখেছিলাম। কবি ও অধ্যাপক খালেদ হোসাইনের স্নেহ, উৎসাহ এবং তত্ত্বাবধান দীর্ঘদিন পর আমাকে গবেষণারত করেছে। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রইল। আর, ফেলোশিপ দিয়ে এই গবেষককে পৃষ্ঠপোষকতা দেবার জন্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই।

রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে তথ্যগত সংবাদ পাওয়া যাবে, এমন গ্রন্থ বাংলাদেশে পাওয়া দুরূহ—তা আমার জানা ছিল। আমার প্রিয় ব্যক্তি সন্‌জীদা খাতুন তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ আমাকে উজাড় করে দিয়েছেন; ফলে তথ্যসংগ্রহের কাজটি আমার জন্যে অনেক সহজ হয়েছে। আর, তাঁর পরামর্শ ও আনুকূল্য আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, যেকোনো অর্থেই।

বাংলাদেশে পাইনি এমন কিছু গ্রন্থের প্রতিলিপি অধ্যাপক চিত্তপ্রিয় ঘোষের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে শেষ-মুহূর্তে জোগাড় করে কবি সন্দীপন চক্রবর্তী আমাকে

পাঠিয়েছেন, যা রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে কিছু দুর্লভ তথ্য সংযোজনে আমাকে সাহায্য করেছে।

এই গবেষণা করতে গিয়ে যে সকল বন্ধু আমাকে প্রয়োজনীয় প্রেরণা দিয়ে, চিন্তার বিনিময় করে, পরামর্শ দিয়ে, দু-একটি গ্রন্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাঁদেরকে বিশেষভাবে স্মরণ করছি।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যাঁদের স্মৃতিকথা আমার গবেষণার রসদ জুগিয়েছে, সেই সব মানুষের প্রতি আমার অশেষ শ্রদ্ধা রইল। যেসকল গবেষক রবীন্দ্রনাথের গানের তথ্যানুসন্ধান ও যাচাইয়ে নিরন্তর সম্পাদনায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন, তাঁদের প্রতিও আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। যাঁরা রবীন্দ্রগানের গবেষক নন, অথচ এই গান নিয়ে বেশ কিছু অনুভবী আলোচনা করে আমার চেতনাকে শাণিত করেছেন, তাঁদের কাছেও আমি ঋণী।

'রবীন্দ্রনাথের গান: গানের তথ্য গানের সত্য' শিরোনামের এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে তথ্যগত সংবাদ পাওয়া গেছে, এমন সব গানের সন্নিবেশ করা হয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের *গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী* থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের মতো করে গানের রচনাকাল এবং তা কত বছর বয়সে রচিত, এই তথ্যটি নেওয়া হয়েছে, যার তথ্যনির্দেশ অধ্যায়ের শেষে না করে ওই অংশেই তথ্যসূত্র হিসেবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-কৃত রবীন্দ্রনাথের গানের কালানুক্রমিক সূচি আমার কাজটিকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। তাঁর কাছে আমার অশেষ ঋণ।

ঋণ শোধ করা যায় না, এটা খুব বিব্রতকর ব্যাপার। তাই তা কেবলই স্বীকার করে নেবার রীতিতে পরিণত হয়েছে। যাঁরা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের ঋণ আমি স্মরণ করছি। এবং এই গবেষণাকর্মটির যদি কিছুমাত্র ভালো দিক থেকে থাকে, তাহলে আমি তাঁদেরকে কৃতজ্ঞচিত্তে সেই ভালোটুকুর অংশীদার করে নিলাম।

boiboi

ভূমিকা

‘রবীন্দ্রনাথের গান: গানের তথ্য গানের সত্য’ শিরোনামের এই গবেষণাটি শিল্পসৃষ্টির রহস্য অনুধাবনের একটা প্রয়াস মাত্র। আর তার পাশাপাশি শিল্প-আস্বাদনের সময় শিল্পসৃষ্টির কালে শিল্পীর চেতনায় যে অভিঘাতটি কাজ করে, বা যে প্রত্যক্ষ ঘটনা বা তথ্য একজন শিল্পীকে শিল্পনির্মাণের দিকে উসকে দেয়—সেই তথ্যকে জড়িয়ে নেয়াটা শিল্প-আস্বাদনে কতটুকু জরুরি, তারও একটা বিবেচনা রয়েছে এখানে। আর এ কাজটি করতে গিয়ে আমি রবীন্দ্রনাথের গানের তথ্যানুসন্ধান এবং তথ্যকে আস্বাদনকালে সম্পৃক্ত করবার বিষয়টি বেছে নিয়েছি মাত্র। আশা করি, এই গবেষণা এবং গবেষণা-পরবর্তী সিদ্ধান্তটি অপরাপর শিল্পের ক্ষেত্রেও বোধের অভিন্নতা তৈরি করবে।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথামূলক রচনা, চিঠিপত্র, সংগীতচিন্তার সংকলনে তাঁর গান নিয়ে বিস্তর তথ্য রয়েছে। তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছেন এমন সব গুণীজনদের স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথের গানের রচনাপট সম্পর্কে জানা যায়। শৈলজারঞ্জন মজুমদারের *যাত্রাপথের আনন্দগান*, সাহানা দেবীর *স্মৃতির খেয়া* এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের *গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী* তথ্যের অনেক বড় উৎস হিসেবে কাজ করেছে। শান্তিদেব ঘোষের রবীন্দ্র-সংগীত গানের তথ্য দেবার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, পার্থ বসুর গায়ক *রবীন্দ্রনাথ*, প্রশান্তকুমার পালের *রবিজীবনী*-তে বিপুল তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। উল্লিখিত গ্রন্থগুলি তথ্য সংকলনের উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি করা নয়। বর্তমান গবেষণায় গানের তথ্য সংকলনের অভিপ্রায় এবং সেই সব তথ্যের সঙ্গে উপলব্ধির সত্যকে মিলিয়ে দেখে শিল্প-আস্বাদন সংক্রান্ত কিছু প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়াস রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের গানের কোনো অভিব্যক্তিই শেষ পর্যন্ত স্পর্শগ্রাহ্য হয়ে থাকে না। ‘তুমি’র আকারের মধ্যে নিরাকার এক ‘তুমি’-কে ভরে দিয়েছেন তিনি।

জানাশোনা শব্দের মধ্যে তিনি ব্যাপ্ত করে রেখেছেন শব্দোত্তীর্ণ অনুভূতির মহিমা। ফলে কোনো নির্দিষ্ট সময়চেতনা কাজ করে না গান শুনতে গিয়ে। তার পরও তথ্যকে জড়িয়ে নেবার, এমনকি অতথ্যকে সম্পর্কিত করবার একটা রীতি ক্রমে গড়ে উঠেছিল গান শুনবার মুহূর্তে, কোনো গানের আসরে, এখনও সেই রীতিটি রয়েছে। গানের আসরে গানের এই রচনাপটের সন্ধান, ব্যক্তিগত সম্পর্কের তথ্যের উপস্থাপন ঐ গান আস্বাদনের জন্যে অপরিহার্য কোনো তত্ত্ব হতে পারে না—এ বিষয়ে সংশয় নেই। তাঁর জীবনের আন্তরিক অভিজ্ঞতাগুলি—আনন্দ, বেদনা ও যন্ত্রণার ইতিহাস, তাঁর অন্তরঙ্গ জীবন কতখানি ছাপ ফেলে গেছে তাঁর গানে, অথবা গানকে অবলম্বন করে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ কতখানি বেরিয়ে আসেন শিল্পী রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে—এসব প্রসঙ্গে আমাদের কৌতূহল কীভাবে যেন রয়েই যায়। ফলে, সম্প্রতি তথ্যকে সংশ্লিষ্ট করে নেয়াটা অনিবার্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই, শিল্পসৃষ্টির পেছনের খবরটি জানা এবং শিল্প-আস্বাদনে তথ্যকে সংলগ্ন করে নেবার তাৎপর্য বিবেচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

আবার, এই গানের তথ্যের সাথে অনুভবের সত্যের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কেবল কোনো মুহূর্তের উপলব্ধিকেই ধরতে পারা গেছে, কারণ আস্বাদনকারীর অনুভূতি নিয়তই সঞ্চরণশীল, গতিমান ও পরিবর্তমান। আর বলাই বাহুল্য, আস্বাদনকারীভেদে এই উপলব্ধির সত্য পালটাতে পারে; বড়জোর তাতে একটা ঐক্যসূত্র থাকতে পারে মাত্র। আবার মগ্নতার ওপর নির্ভর করতে গিয়ে, আবেগময় উপলব্ধির প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে প্রচলিত গবেষণা-রীতি পরিপূর্ণভাবে অনুকূল হয়ে ওঠেনি।

এই গবেষণার প্রথম অধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের গান: তথ্য ও সত্য প্রসঙ্গ'-তে 'গানের তথ্য' ও 'গানের সত্য' ব্যাপারটা কী, রবীন্দ্রনাথের গানের তথ্য এবং গানের সত্য চিহ্নিত করবার পথে কীভাবে এগোনো সম্ভব, সাধারণভাবে শিল্পসৃষ্টিতে তথ্য ও সত্যের সম্পর্ক কী হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তথ্য ও সত্য সম্পর্কে কী ভেবেছেন, রবীন্দ্রনাথের গানের তথ্যানুসন্ধান কেন জরুরি—এই সব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ করা দরকার, তথ্য ও সত্যের সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়গ্রাহী আলোচনা এই গবেষণাটিকে পথ দেখিয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় 'তথ্য-সহায়ক গান'-এ আস্বাদনকালে তথ্যকে জড়িত করে নেওয়া যায়, এমন গানের তথ্যের সংকলন করা হয়েছে। একই সঙ্গে তথ্যের সঙ্গে গানের উপলব্ধির সত্যের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্যকে জড়িয়ে

লেখকের কথা

কলকাতার মনফকিরা থেকে প্রকাশিত ‘রবীন্দ্রনাথের গান: গানের তথ্য গানের সত্য’ গ্রন্থটি বাংলাদেশের বুবুক প্রকাশনী থেকে পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে—এটা আমার জন্যে ভীষণ আনন্দের ব্যাপার। এই রচনাটির সঙ্গে আমার একটা বিশেষ সময়ের চিন্তা জড়িয়ে আছে। এই সময়ে এসে এটিকে বদলে দেবার সুযোগ ছিল। সুযোগটি গ্রহণ করলে গ্রন্থটি হয়তো সংবর্ধিত হতো, তবে তা আর ওই সময়ের স্মারক হয়ে থাকত না। ফলে কলকাতায় যেমনটি ছাপা হয়েছিল, এদেশে একইরকম ছাপা হলো। তবে নতুন করে ডিজাইন এবং সম্পাদনার কাজটা করেছে বুবুক।

গান কিংবা যেকোনো মহৎ শিল্প ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে পাবার বিষয় নয়। আর তা বিশ্লেষণ করতে যাওয়া অস্তিত্বকে যাচাই করতে যাওয়ার মতোই দুরূহ। এই গ্রন্থে শিল্পের আস্বাদনকালে তার সৃষ্টিকালীন অভিঘাতকে জড়িয়ে নেবার তাৎপর্য অনুসন্ধান করা হয়েছে—আর তাতে ‘রবীন্দ্রসংগীত’ কেবল ‘টুল’ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য কোনো শিল্পকে এ ক্ষেত্রে অনায়াসে বিবেচনা করা যেত।

গ্রন্থটি রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে আগ্রহী বাঙালি পাঠক ও গবেষকের কাজে লাগলে আমার খুব ভালো লাগবে।

অভী চৌধুরী
বাংলা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের গান: তথ্য ও সত্য প্রসঙ্গ

'গানের তথ্য' হচ্ছে গান রচনার পেছনের কোনো ইতিহাস। আর 'গানের সত্য' হচ্ছে সেই গানটি যে উপলব্ধিতে পৌঁছে দেয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি গান রচনার পেছনে সুস্পষ্ট কোনো ঘটনার অভিঘাত রয়েছে, এমনটি নয়। তাঁর আত্মজৈবনিক বিবরণ থেকে, তাঁর পরিজনদের স্মৃতিকথা থেকে কিংবা তাঁর প্রসঙ্গে লেখা জীবনীগ্রন্থ থেকে আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব তাঁর বেশ কিছু গানের সৃষ্টির পটভূমি। তথ্যভূমিকা-সহ সেই ধরনের গানের একটি তালিকা প্রণয়ন করাও সম্ভব।

boiBook

আবার, সেই গানগুলোর তথ্যের সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাব অন্তত দু-রকম প্রতিক্রিয়া কাজ করছে আমাদের মনে। কখনো আমরা উদ্দীপ্ত হচ্ছি, আমাদের প্রত্যাশার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে সেই স্মৃতি—যা কখনো-বা গানটি আস্বাদনে অপরিহার্য হয়ে উঠতে চাইছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের চেতনায় রচিত 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি' কিংবা 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে' গান-দুটিতে সে আন্দোলনের স্মৃতি জড়িয়ে নিলে যেন আমাদের যৌথ জীবনচেতনা প্রকট হয়ে ওঠে। আমাদের আত্মশক্তি যেন বেড়ে ওঠে তাতে।

আবার, কোনো কোনো গান উপলব্ধির যে সত্যে পৌঁছে দেয়, তার সঙ্গে সেই গানের তথ্যের সম্পর্ক যুক্ত করে নিলে মনে হতে পারে ঘটনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেই বুঝি-বা আস্বাদন যথাযথ হতো। তখন আমরা আর মনে রাখতে চাই না তথ্যের সেই তুচ্ছতা, আরও বড় করে যেন বুঝেছি গানের সেই ইশারা। সেই জানাশোনা যেন গ্লানি নিয়ে আসে। আমরা তখন তথ্যকে দূরে সরিয়ে রাখাটাই যেন পছন্দ করি, অজ্ঞতাকে কামনা করি, অজ্ঞতাকে আহ্বান করি। ১৩৩৩ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকার পঁচিশ বছর পূর্তিতে আশীর্বাদস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের কবিতার সুসংবদ্ধ রূপ 'পরবাসী চলে এসো ঘরে' গানটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়,

উপলক্ষের দ্বারা লক্ষ্য কী মর্মান্তিকভাবেই না চাপা পড়ে যেতে পারে। 'বাহিরে অন্তরে' নির্বাসিত পরবাসী আমাদের মনে যে পুলক সঞ্চার করে, তা ঐ তুচ্ছ খবরের টানে বাধাগ্রস্ত হয় যেন।

বিবেচ্য হলো, সৃষ্টিকালীন ইতিহাসের তথ্যটাই কি গানটির ভিতরে রূপায়িত হচ্ছে, না তাকে ছাড়িয়ে সে অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে। ঘটনার অভিঘাতের সঙ্গে সৃষ্টির যোগ আছে কি না, সেই প্রশ্ন আমরা সাহিত্যবিচারে তুলতে পারি। ঘটনার সঙ্গে রচনার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে সাহিত্য আস্বাদনের একটি স্বতন্ত্র পথ পাওয়া যেতে পারে।

গল্প বা উপন্যাসে ঘটনা থেকে ঘটনায় যাবার পথ রয়েছে। কিন্তু গান বা কবিতা ঘটনা থেকে ঘটনায় যাওয়ার সেরকম সরল কোনো পথ নয়, তা অবিশ্লেষ্য অব্যাখ্যেয় উপলব্ধিরই নামান্তর, এমনকি তার কাছে আমাদের প্রত্যাশাও সুচিহ্নিত নয়। 'রবীন্দ্রনাথের গান: গানের তথ্য গানের সত্য' অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের প্রায় দু-হাজার গানের যে কয়টি ক্ষেত্রে তথ্যগত সংবাদ পাওয়া সম্ভব, তার সংকলন করা এবং সেই সব গানের তথ্যের সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথের গান আস্বাদনের একটি স্বতন্ত্র পথ খুঁজে নেয়া।

boibook

দুই

মানুষ কেবল প্রত্যক্ষ ঘটনার মধ্য দিয়ে যায়, তা নয়। মানুষের চেতনায়, দ্বিধার মধ্যে, অন্যমনস্কতা ও বিরোধের মধ্যেও তার জীবনের সঞ্চারণ ও বিকাশ। ফলে, জীবনটা অনির্ণেয় হয়ে ওঠে মানুষের, শিল্পীর তো বটেই।

তাই, সব সময়ই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ কোনো অভিঘাত কাজ করে শিল্পসৃষ্টিতে, এমনটি নয়। আর সেই অস্পষ্ট বা স্পষ্ট অভিঘাতের সঙ্গে ক্রিয়াশীল থাকে মানুষের চেতনায় মিশে-যাওয়া অভিজ্ঞতার স্তর-স্তরান্তর। আবার, 'সময়' মাত্রা ক্রিয়াশীল থাকায় একই ঘটনার অভিঘাত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন চেতনা সঞ্চারিত করে শিল্পীর মনে।

ফলে, শিল্পসৃষ্টির কালে জড়িত কোনো তথ্যের সঙ্গে শিল্প-উপলব্ধ সত্যের সম্পর্কটি একই সরলরেখায় পাওয়া যায় না। ঘটনার বাইরে শিল্পীর যে জীবন, ঘটনা থেকে মনে ছাপ তুলে নেবার সময় সেই জীবন-সৌন্দর্যের অভিঘাতই তথ্যের সঙ্গে সত্যের দূরবর্তী সম্পর্ক তৈরি করে দেয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তথ্য-সহায়ক গান

মানবীয় বিচিত্র অনুভূতি কণ্ঠকে অবলম্বন করে সুরের মহিমায় বিশ্বচরাচরে ছড়িয়ে দিতে পারে বলেই সংগীত আত্মার মুক্তির আস্বাদ দেয়।

গান সংগীতেরই বিশেষ নির্মিতি। সুখ বা দুঃখ, জাগতিক বা পারলৌকিক, বা বিমিশ্র অনুভূতির সাংগীতিক উত্তরণ পুঞ্জীভূত মানবিক ও জাগতিক কলুষ ও ক্লান্তির বিমোক্ষণ ঘটায়।

গানের সুর এক প্রাকৃত প্রবাহ, বাণী এক মানবিক উদ্ভাসন; উভয়ের সমবায় ব্যক্তি ও প্রকৃতির মেলবন্ধনই রচনা করে। গানের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্রায়তন ব্যক্তি বৃহদায়তন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

সংগীত শুদ্ধতম শিল্প এই অর্থে যে এতে জাগতিক মালিন্যের জায়গা নেই।

কিন্তু সংগীতকার যেহেতু একজন সামাজিক মানুষ, যার পশ্চাতে সমকালীন চাপ-তাপ ও যুগের স্বভাব অনিবার্যভাবে সক্রিয় থাকে, তাই সমকালীন ঘটনা-পুঞ্জ তার চিন্তন ও অনুভূতির জগতে নানা তরঙ্গ সৃষ্টি করে।

ফলে, গানের বাণী ও সুর সৃষ্টিতে এসবের প্রভাব থাকতেই পারে, থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই প্রভাব সম-স্বভাবসম্পন্ন নয়।

তাই, সংগীত-শিল্প যে আস্বাদনে পৌঁছে দেয়, তা থেকে কখনোই এর সৃষ্টির পেছনের প্রেরণা হিসেবে নিহিত কোনো ঘটনাকে শনাক্ত করা যায় না, কখনো-বা উৎস হিসেবেও বিবেচনা করা যায় না।

তবে এমন হতেই পারে, অভিঘাতটিকে বা উপলক্ষটিকে জড়িয়ে নিলে আস্বাদ্য কোনো গান খর্ব হয় না, বরং আস্বাদন বেড়ে ওঠে।

এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের সেই সব গানেরই তথ্য উল্লেখ করব, যা ওই গানের আস্বাদনে বাধা সৃষ্টি করছে না, বা কোনো-না-কোনোভাবে সহায়তা করছে।

গান ১ . পর্যায়: আনুষ্ঠানিক, ৬ সংখ্যক গান, *স্বরবিতান ৫৫*

দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিত যদি
বলো, দেব, কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়॥
সম্মুখে রয়েছে তার তুমি প্রেমপারাবার,
তোমারি অনন্তহৃদে দুটিতে মিলাতে চায়॥
সেই এক আশা করি দুইজনে মিলিয়াছে,
সেই এক লক্ষ্য ধরি দুইজনে চলিয়াছে।
পথে বাধা শত শত, পাষাণ পর্বত কত,
দুই বলে এক হয়ে ভাঙিয়া ফেলিবে তায়॥
অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে
তোমারি স্নেহের কোলে যেন গো আশ্রয় মিলে,
দুই হৃদয়ের সুখ দুটি হৃদয়ের দুখ
দুটি হৃদয়ের আশা মিলায় তোমার পায়॥

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, সংস্করণ পৌষ ১৩৮০, পৃ. ৬০৯]

boiboi

গানের তথ্য

২০ বছর বয়সে রচিত গান।

[তথ্যসূত্র: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী*, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ পৌষ ১৪১০, পৃ. ১৪]

প্রশান্তকুমার পাল-এর রবিজীবনী-তে এ গানটি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়:

ড. নাগ লিখেছেন: ১৮৮১ (১২৮৮, ১৫ই শ্রাবণ) রাজনারায়ণের চতুর্থ কন্যা লীলা দেবীর সঙ্গে ভবিষ্যত "সঞ্জীবনী" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহ। তার নিখুঁৎ বিবরণ সৌভাগ্যক্রমে লীলা দেবী লিপিবদ্ধ করে গেছেন, এবং পুত্র বন্ধুবর সুকুমার মিত্রের সৌজন্যে পড়বার সুযোগ পেয়েছি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সেই প্রথম জমকাল বিবাহ-সভা— আচার্য হয়েছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী স্বয়ং; এবং "নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (রামমোহন জীবনচরিত রচয়িতা), সুন্দরীমোহন দাস, কেদারনাথ মিত্র, অন্ধ চুণীলাল ও নরেন্দ্র

দত্ত (পরে স্বামী বিবেকানন্দ) মহাশয় গণ সংগীত করিয়াছিলেন… শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়— দুই হৃদয়ের নদী (সাহানা-ঝাপতাল); জগতের পুরোহিত তুমি (খাম্বাজ একতালা), শুভদিনে এসেছ দোঁহে (বেহাগ তেতালা)— প্রভৃতি সংগীত রচনা করিয়া গায়কদিগকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন।”…

যোগীন্দ্রনাথ বসুকে লেখা পত্র থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ (সম্ভবত চন্দননগর থেকে) দুটি গান সুর-তাল-নির্দেশ-সহ তাঁকে লিখে পাঠিয়েছিলেন; উপরে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী তিনি নিজেই গানগুলি গায়কদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এতে মনে হয় অন্তত এই প্রয়োজনেই শ্রাবণ মাসের প্রথম দিকে তিনি কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসছিলেন। গায়কদের মধ্যে নরেন্দ্র দত্ত অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এই তথ্যটিও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।… এই তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, অন্তত এই সংগীত-শিক্ষার আসরে উভয়ের সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ ঘটেছিল। বিবেকানন্দ তাঁর সম্পাদিত সংগীত কল্পতরু গ্রন্থে ‘দুই হৃদয়ের নদী’ গানটি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন…[১]

রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য গায়িকা সাহানা দেবী তাঁর স্মৃতিকথা *স্মৃতির খেয়া* গ্রন্থে ‘দুই হৃদয়ের নদী’ গানটি সম্পর্কে লিখেছেন:

ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে আমাদের পরিবারের সকলের কবে থেকে যে ঘনিষ্ঠতার সুরু[শুরু] তা আমার জানা নেই। মায়ের মুখে শুনেছি ‘দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি’ গানটি তাঁরই বিবাহোপলক্ষে রচনা করে, রবীন্দ্রনাথ গানটি নিজে বিয়েতে গেয়েছিলেন। তখন কবির গলা[য়] এত জোর ছিল, শুনেছি বড় প্যান্ডেলের শেষ পর্যন্ত তাঁর গলা পৌঁছত অনায়াসে। আমরা যখন তাঁর গান শুনেছি তখন গলার জোর অনেক কমে এসেছে। আস্তেই বেশির ভাগ গাইতেন, ঠিক গলা ছেড়ে গান গাইতে বিশেষ বড় একটা শুনিনি।[২]

গানের সত্য

দুইটি সম্মিলিত জীবনের যাত্রা বিকাশ এবং পরিণতি রয়েছে এই গানে। এখানে ঈশ্বরের কৃপায় দুটি হৃদয়ের যেকোনো দুর্গম পথ-চলা যেন সহজ হয়, এটা ঈশ্বরের কাছেই প্রার্থনা যেন। জীবনাবসানের পর ঈশ্বরের আন্তরিক প্রযত্ন পাবার

boibook

তৃতীয় অধ্যায়

তথ্য-বিম্বিত গান

এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের কিছু গানের আলোচনা করব, যেই গান সৃষ্টির পেছনে এমন কিছু পটভূমিকা বা তথ্য রয়েছে, যা ওই গান আস্বাদনকালে জড়িয়ে নিলে আস্বাদনকে বাধাগ্রস্ত করে। প্রতিটি গানের তথ্যের সঙ্গে উপলব্ধির সত্যের কথা উল্লেখ রয়েছে, যাতে তথ্যের সঙ্গে এর দূরবর্তিতার বিষয়টি আমরা অনুধাবন করতে পারব।

boobook

গান ১ . পর্যায়: প্রকৃতি (বসন্ত), ১৯২ সংখ্যক গান, *নবগীতিকা* ২

ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী আমের মঞ্জরী,
আজ হৃদয় তোমার উদাস হয়ে পড়ছে কি ঝরি॥
আমার গান যে তোমার গন্ধে মিশে দিশে দিশে
ফিরে ফিরে ফেরে গুঞ্জরি॥
পূর্ণিমাচাঁদ তোমার শাখায় শাখায়
তোমার গন্ধ-সাথে আপন আলো মাখায়।
ওই দখিন-বাতাস গন্ধে পাগল ভাঙল আগল,
ঘিরে ঘিরে ফিরে সঞ্চরি॥

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, সংস্করণ পৌষ ১৩৮০, পৃ. ৫০২]

গানের তথ্য

৬০ বছর বয়সে রচিত। রচনা: ২৮ ফাল্গুন ১৩২৮ (১২ মার্চ ১৯২২) [শান্তিনিকেতন]।

[তথ্যসূত্র: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী*, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ পৌষ ১৪১০, পৃ. ১৮৬]

এই গানটি সম্পর্কে শান্তিদেব ঘোষ উদ্ধৃত করেছেন জনৈক প্রাক্তন ছাত্রের স্মৃতিচারণ:

মনে পড়ে বসন্তোৎসবের কথা (১৩২৮)। দিনুবাবুর বাড়িতে সকালবেলা মহড়া চলছে। এমন সময় এলেন মঞ্জুশ্রী দেবী [সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা]। কবি তাঁকে দেখেই বলে উঠলেন, ‘দিনু, এই যে আমের মঞ্জুরী এসেছে; তাহলে আমের বোলের গানটা মঞ্জুই গাইবে, কি বলিস্ ?’ উত্তরে দিনুবাবু বললেন, ‘তা আমাদের পালায় ত আমের মঞ্জুরী নেই।’ সহসা কবির ভুল ভাঙলো, বললেন, ‘তা কি আর হয়েছে, নাতনীর সঙ্গে নয় একটু পরিহাস করলুম।’ কিন্তু এই নেহাত ব্যক্তিগত পরিহাসকে কেন্দ্র করেই কবি বিকেলবেলা লিখে নিয়ে এলেন— ‘ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী।’[১]

boobook

গানের সত্য

এই গানে যেন প্রকৃতির সঙ্গে হৃদয়ের একান্ত কথোপকথন, ভাববিনিময়। বসন্তের আগমনে প্রকৃতির সাথে হৃদয় এক সুরে বাঁধা পড়ে যায়। তখন তাদের কথোপকথন সেই কোন সুদূরের ভুলে-যাওয়া সুখস্মৃতি বয়ে নিয়ে আসে। প্রকৃতি মঞ্জরিত হলো, তাতেই তাঁর আনন্দ। এই গানে ছন্দোময়তা আছে, দৃশ্য আছে, গন্ধ আছে। ‘আলো’ আর ‘গন্ধ’ এক জিনিস নয়, কিন্তু এই গানে তা মিশে যাচ্ছে। দখিন বাতাস গন্ধে পাগল হয়ে আগল ভাঙছে, তা-ও এক আশ্চর্য খবর। বসন্তের সর্বোচ্চ প্রাকৃতিক সীমা আমরা পাই এই গানে। মানুষের স্বভাব আরোপ করা হয়েছে (personification) প্রকৃতির মধ্যে, যেমন: মঞ্জরীর হৃদয় উদাস হয়ে ঝরে পড়া। ব্যক্তিগত পরিহাসের যে খবরটি পাই এই গানের তথ্যে, আস্বাদনকালে তার কোনো প্রভাব পড়ে না। প্রায় নির্বিশেষ একটি প্রাকৃতিক অনুষঙ্গকে রবীন্দ্রনাথ এক কালোত্তীর্ণ মহিমায় পৌঁছে দিয়েছেন, যা যুগপৎ স্মৃতি, শ্রুতি, শ্রবণ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আলোড়িত ও আচ্ছন্ন করে।

চতুর্থ অধ্যায়

রচনা-পরবর্তী তথ্য ও সত্য

রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গান রয়েছে যা সৃষ্টির পেছনে সুস্পষ্ট কোনো ঘটনার অভিঘাত রয়েছে, এমনটি জানা যায় না। তবে, তা পরবর্তী কোনো সময়ে কোনো বিশেষ ঘটনার সঙ্গে, তথ্যের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে বিবেচ্য হয়ে ওঠে। যে বিবেচনা থেকে আমরা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ কিছু বিষয়, সংগীত-সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত বিশেষ কিছু খবর, একই সঙ্গে শিল্পসৃষ্টির রহস্য জানতে পারব। এই তথ্য কখনো-বা গান আস্বাদনে অনুকূল হচ্ছে, কখনো-বা প্রতিকূল। কিন্তু কোনো-না-কোনোভাবে বিশেষ একটা খবর দিচ্ছে, যাতে আমাদের কৌতূহল মিটছে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে। রচনাপরবর্তী তথ্য-সংলগ্ন এই গানগুলির তথ্যের গুরুত্ব ও সত্য-বিচার এই অধ্যায় জুড়ে রয়েছে।

গান ১ . পর্যায়: প্রেম, ৩০৫ সংখ্যক গান, *স্বরবিতান* ১০

বাঁশরি বাজাতে চাহি, বাঁশরি বাজিল কই।
বিহরিছে সমীরণ, কুহরিছে পিকগণ,
মথুরার উপবন   কুসুমে সাজিল ওই॥
বিকচ বকুলফুল   দেখে যে হতেছে ভুল,
কোথাকার অলিকুল   গুঞ্জরে কোথায়।
এ নহে কি বৃন্দাবন,   কোথা সেই চন্দ্রানন
ওই কি নূপুরধ্বনি,   বনপথে শুনা যায়
একা আছি বনে বসি,   পীত ধড়া পড়ে খসি,
সোঙরি সে মুখশশী   পরান মজিল সই॥

একবার রাধে রাধে ডাক্ বাঁশি মনোসাধে-
আজি এ মধুর চাঁদে মধুর যামিনী ভায়।
কোথা সে বিধুরা বালা— মলিনমালতীমালা,
হৃদয়ে বিরহজ্বালা, এ নিশি পোহায় হায়।
কবি যে হল আকুল, একি রে বিধির ভুল,
মথুরায় কেন ফুল ফুটেছে আজি লো সই॥

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, সংস্করণ পৌষ ১৩৮০, পৃ. ৩৯২-৩৯৩]

গানের তথ্য

২৩ বছর বয়সে রচিত।

[তথ্যসূত্র: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী*, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ পৌষ ১৪১০, পৃ. ৩১]

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী তাঁর রবীন্দ্রস্মৃতি গ্রন্থের 'সংগীতস্মৃতি' অধ্যায়ে এই গানটি সম্পর্কে লিখেছেন:

> ...কৃষ্ণনগরে তখন রামতনু লাহিড়ীর ছেলে সত্য লাহিড়ীকে কেন্দ্র করে একটি উচ্চাঙ্গ গানের আসর ছিল, আমার স্বামীও তাতে যোগ দিতেন। পরে তাঁর কাছেই শুনেছি যে, সেই আসরে রবিকাকাকে গান গাইতে বলায় তিনি 'বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই' গানটি গেয়েছিলেন। এবং সেই-সব উচ্চাঙ্গসঙ্গীতপ্রিয় শ্রোতাদের কাছ থেকে নাকি অনেক বাক্যবাণ তাঁর উপরে বর্ষিত হয়েছিল, যেমন, 'হ্যাঁ, বাঁশরী অনেকে বাজাতে চায়, কিন্তু বাঁশরী বাজাতে চাইলেই কি বাঁশরী বাজে। বাঁশরী বাজাতে হলে শিক্ষা চাই' ইত্যাদি। কারণ সে সরল সুরের ভিতরে তাঁদের অভ্যস্ত তানকর্তব তাঁরা খুঁজে পাননি।[১]

boobook

গানের সত্য

বৈষ্ণব পদাবলির একটা কাব্যিক আবহ রয়েছে এই গানে। এই গানে নিহিত কৃষ্ণের মনের এক বিরহব্যাকুল অবস্থা আমরা জানতে পারি, যেখানে রাধাকে বাঁশিতে ডেকে নেওয়া যাচ্ছে না, অথচ প্রাকৃতিক পরিস্থিতি কাতর করে তুলেছে। তথ্যকে জড়িয়ে নিলে বুঝতে পারি, রবীন্দ্রনাথের গানের নিরাভরণতার মধ্য

আমি সে কথায় কান দিলাম না।

পরে আশ্রমের এক সহকর্মীর কাছে জানতে পারলাম, তাঁকে নাকি গুরুদেব বলেছেন যে, আমিই নাকি 'সাঁওতালি ছেলে'র জায়গায় 'সাঁওতালি মেয়ে' করে দেবার জন্য বলেছি। তখনই ব্যাপারটা আমার কাছে ধরা পড়েছিল যে, সবটাই ঠাট্টা।

আমি গুরুদেবকে গিয়ে বললাম— আমি বুঝতে পেরেছি যে, 'সাঁওতালি ছেলে'র জায়গায় 'মেয়ে' করার ব্যাপারটাই বানানো। তখন গুরুদেব বললেন— বুঝেছ ঠিকই, একটু দেরী করেছ আর কি?[৮]

গানের সত্য

মেঘভারাতুর বর্ষাপ্রকৃতির আবহে শ্যামল শোভন সৌন্দর্যে সাঁওতালি ছেলেকে স্থাপন করে দেখা হয়েছে এই গানে। প্রকৃতির মধ্যে মানুষকে রেখে সরল পর্যবেক্ষণ এই গান। গানটির বাণী-বিন্যাসের স্বাভাবিকতার মধ্যে এক ধরনের প্রসন্নতা আছে। অন্যদিকে গানটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকা তথ্যে, রবীন্দ্রনাথের বৈদগ্ধ্যপূর্ণ রসবোধের পরিচয় মেলে।

boibook

গান ৮ . পর্যায়: প্রেম ও প্রকৃতি, ৯৩ সংখ্যক গান, *স্বরবিতান ৫৮*

রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা—
মন যে কেমন করে, হল দিশাহারা।
যেন কে গিয়েছে ডেকে,
রজনীতে সে কে দ্বারে দিল নাড়া—
রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা॥
বঁধু দয়া করো, আলোখানি ধরো হৃদয়ে।
আধো-জাগরিত তন্দ্রার ঘোরে আঁখি জলে যায় যে ভ'রে।
স্বপনের তলে ছায়াখানি দেখে মনে মনে ভাবি এসেছিল সে কে—
রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা॥

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, সংস্করণ পৌষ ১৩৮০, পৃ. ৯০৯]

গানের তথ্য

৭৮ বছর বয়সে রচিত। রচনা: ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ (১৯ ভাদ্র ১৩৪৬)।

[তথ্যসূত্র: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী*, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ পৌষ ১৪১০, পৃ. ২৯৯]

শৈলজারঞ্জন মজুমদার জানিয়েছেন:

১৯৩৯ সনের... বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান আরম্ভ হল সবগুলি নতুন লেখা গান নিয়ে। অনুষ্ঠান যখন মাঝামাঝি অবস্থায় তখন স্বাস্থ্যের কারণে গুরুদেবকে চলে যাবার জন্য বার বার তাগিদ এল। আমি অনুরোধ করেছিলাম 'পাগলা হাওয়ার বাদল-দিনে' গানটি শুনে যাবার জন্য। গুরুদেব সেটি শোনার পরই চলে গেলেন। অনুষ্ঠানও এখানেই বন্ধ করে দিলাম।

এই অসমাপ্ত বর্ষামঙ্গল উৎসবের কয়েকদিন পরে গুরুদেব বলেছিলেন আর একটি বর্ষামঙ্গল করার কথা। যাতে আগের ছ'টি পুরানো গান আর নতুন যা গাওয়া হয়নি সেগুলি যোগ করা হবে। শুধু গান দিয়েই এই অনুষ্ঠান হবে। এর নাম দিলেন 'বাসি বর্ষামঙ্গল'।

উত্তরায়ণে 'উদয়ন' বাড়ির সামনে হল এই বাসি বর্ষামঙ্গল। সেদিন সকালবেলা অনুষ্ঠান-সূচী নিয়ে আমি যখন গুরুদেবের কাছে গেলাম তখন গুরুদেব বললেন— এখনই যদি তোমাকে আর একটি নতুন গান শিখিয়ে দিই তাহলে সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে ছেলেমেয়েদের দিয়ে গাওয়াতে পার কি? এটা হলে তোমার প্রস্তাব মত ষোলটি গান হয়ে যায়, ষোলকলা পূর্ণ হয়।

আমি তখনই রাজী। সেই নতুন গানটি হল— 'রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা'।[৯]

গানের সত্য

বর্ষা মানবানুভূতির বিভিন্ন দরজা-জানালা খুলে দেয়। এই গানে দ্রবীভূত মন অনেক নসটালজিক হয়ে উঠেছে। সুদূর অতীত থেকে আসা কোনো এক মুখচ্ছবি চিত্তকে আচ্ছন্ন করে তুলতে চাইছে। ফলে এক ধরনের কারুণ্য রয়েছে গানটির শেষে। তথ্যানুযায়ী, গানটি অনুরুদ্ধ হয়ে রচিত হয়েছে মনে করা গেলেও তা শিল্পসত্তার স্বাধীন বিকাশেই সৃষ্টি হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

বদলে যাওয়া গান

মানুষের জীবন প্রতি মুহূর্তে যেমন বদলে যেতে থাকে, তেমনি ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে জীবনের অভিঘাতে শিল্পের আস্বাদনও বদলে যায়।[১] এই বদলে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, পূর্ববর্তী কোনো আস্বাদন অসম্পূর্ণ ছিল। রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গান রয়েছে, যে গানগুলির রচনাকালীন বা রচনা-পরবর্তী কিছু ঘটনা বা তথ্য গানগুলির আস্বাদনকে বদলে দিচ্ছে। পূর্ববর্তী আলোচনায় রচনা-পূর্ববর্তী ইতিহাস জানা যায়, এমন গানের আলোচনা করতে গিয়ে গানগুলিকে আমরা দুটি অধ্যায়ে বিভাজন করেছিলাম, 'তথ্য-সহায়ক গান' আর 'তথ্য-বিম্বিত গান' হিসেবে। এবং ঠিক তার পরবর্তী অধ্যায়ে রচনা-পরবর্তী ইতিহাস সংলগ্ন করলে আমাদের আস্বাদনকে বদলে দিচ্ছে, এমন গানগুলির তথ্য ও সত্য বিশ্লেষণ করে মূলত জেনেছি—তথ্যকে সম্পর্কিত করে নিলে রবীন্দ্রসংগীত আস্বাদনকারীর কাছে কীভাবে বদলে যায়। এবার, ঠিক শিল্পসৃষ্টিকালীন বা সৃষ্টি-পরবর্তী ঘটনাকে জড়িয়ে না নিয়েও শিল্প হিসেবে রবীন্দ্রনাথের গান কী কী উপায়ে বদলে যেতে পারে, সেই আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার।

আমরা জানি 'সংগীত' ন্যূনতম প্রতীকবহ একটা শিল্প। আর গান সংগীতেরই একটা বিশেষ নির্মিতি। অপরাপর শিল্পের সঙ্গে গানের মূল পার্থক্য হচ্ছে, তা গায়ক-নির্ভর। ফলে গায়ক-ভিন্নতায় গান এমনিতেই অল্প-বিস্তর বদলে যায়। গানের ক্ষেত্রে এটা মেনে নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্যান্য সংগীতকারের মূল পার্থক্য হল, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানকে অবিকল্প রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। এবং সেই রূপটি যাতে বজায় থাকে, তার জন্যে বিস্তর অনুনয়-অনুরোধ-আক্ষেপ করতে হয়েছে তাঁকে।[২] এবং রবীন্দ্রসংগীতের সুর বজায় রাখার ব্যাপারে তাঁর গভীর উদ্বেগ ছিল। তাছাড়া, সংগীতকার হিসেবে

রবীন্দ্রসংগীতের গায়ক-নির্ভরতা তাঁকে কতটা অসহায় করেছিল, তা-ও আমরা জানি।

রবীন্দ্রনাথ কখনো সুরে কথা বসিয়েছেন, কখনো-বা কথা আগে এসেছে, সুরটি এসেছে পরে। গানের কথাকে আমরা আমাদের ভাষিক সীমানায় পাই, অনুধাবনকেও চিহ্নিত করতে পারি, শব্দ দিয়ে এর প্রতীকীকরণও সম্ভব হয় আমাদের পক্ষে। অথচ সুর এমন এক সাংগীতিক ধ্বনিজগৎ, যা নিরর্থ করে দিতে চায় আমাদের দৈনন্দিনের সঙ্গে জড়িত শব্দসমূহকে। শব্দ আর শব্দের সীমানায় থাকে না। সুর তাকে অজানা-অচেনা পথে অনুভূতিদেশে পৌঁছে দেয়; সেই পথ অনেক জমাট স্মৃতিকে বহন করে নিয়ে আসে, অনেক অজানা স্বপ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। 'আমি' আর 'না-আমি'র ব্যবধান ঘুচে যায় তখন। নিজের সঙ্গে এই বিস্তৃতি নিয়ে সংলগ্নতায় গানই আমাদের নিয়ে যেতে পারে।

গান নিয়ে যথাযথ ও সার্থক উল্লেখের পথে প্রধান অন্তরায়—গানকে আমরা চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতে পাই না। আবার, বিরোধের মতো শোনালেও, গান বিষয়ে যেকোনো কিছু বলা সহজ হয়ে যায়, কারণ গানকে আমরা চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতে পাই, এমনকি চোখ বন্ধ করেও যদি তাকাই, তবু দেখি। গান বিচার-বিশ্লেষণ করতে গেলে তো বটেই, তা আস্বাদন করতে গেলেও এর বিশেষ ধরনের পাঠ আমরা গ্রহণ করে থাকি। এই 'বিশেষ ধরনের' গৃহীত পাঠটি, যারা গানকে দেখতে পাই বা গানকে দেখতে পাই না, তাদের কাছে ভিন্ন-ভিন্নরকম হয়ে থাকে। কবিতার সঙ্গে যদি গানের তুলনা করি, তবে একটি তুলনা এভাবে আসতে পারে যে, লিখিত একটি কবিতাকে যে-কেউ হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারে, শতবর্ষ পরও নির্দিষ্ট ওই কবিতার শরীর পালটায় না; কিন্তু কবিতা কিংবা কবিতা নয়, এমন কিছুকে যখন সুর দেওয়া হয়, যখন তা গান হয়ে ওঠে, তখন যে-কেউ সেই গানকে শোনাতে পারে। সে ক্ষেত্রে গানের বাণী নির্দিষ্ট হলেও, সুরটা নির্দিষ্টভাবে বজায় রাখতে অনুনয় করা হলেও, গায়ক কিন্তু নির্দিষ্ট নয়। অর্থাৎ গানের শরীর পালটাচ্ছে, গানের স্বভাব পালটাচ্ছে, কেবল বজায় থাকছে গানের কথাটুকু, যা কি-না গান নয়।

একটি গানের জন্য একজন গায়ক নির্দিষ্ট না হওয়ায় (এমনটি নির্দিষ্ট হওয়া জরুরি নয়, এমনকি স্বাভাবিকও মনে হয় না), রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের সুর বজায় রাখার মিনতি করে চূড়ান্ত কোনো সাফল্য বোধ করি অর্জন করতে